জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

2010 International Year of Biodiversity

মে-২০১০ May 2010

২২তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা Volume-XXII, No. V

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২০১০ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ

বাংলাদেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা মন্থরতা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরূপ প্রভাব পড়লেও তা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য উপঅঞ্চলের দেশগুলোর তুলনায় কম। সঙ্কটের প্রভাব পড়ে উপঅঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর। যার ফলে রপ্তানি কমে যায় এবং পুঁজির অন্তর্মুখী প্রবাহ হ্রাস পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তার তুলনায় ২০০৯ সালে গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়লেও তা অনুকূল অবস্থায় থাকে। সাধারণভাবে এসব অর্থনীতিতে বৈদেশিক চাহিদার চেয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা একটা বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.২% যার গতি ২০০৯ সালে কিছুটা কমে ৫.৯% হয়। এই প্রবৃদ্ধি এসেছে কৃষি খাতে অর্জিত সুফলে, জিডিপি'তে যার প্রত্যক্ষ অবদান ২০%-এর মতো এবং এ খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাসের প্রধান কারণ তৈরি পোশাক ও বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ পণ্যের রপ্তানি হ্রাস। নিম্নমুখী প্রবণতায় অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক বাজারের প্রতি বাংলাদেশের গুরুত্বের কারণে সঙ্কট সত্ত্বেও পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এসকাপ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ-২০১০ প্রকাশ উপলক্ষে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারকগণ উপস্থিত ছিলেন। সারা বিশ্বের সাথে এ রিপোর্টটি একযোগে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী আর্থার এরকেনের সভাপতিত্বে রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

থাকে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত রেমিটেন্স অভ্যন্তরীণ চাহিদা স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। তবে মূলধনী পণ্যের আমদানি হ্রাসের অর্থ হলো নতুন নতুন বিনিয়োগ কার্যক্রমে দুর্বলতা যা বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি চাহিদার দুর্বলতা ও অন্যান্য অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। ২০১০ সালে বেসরকারি খাতে ঋণ আদায়, রেমিটেন্সের প্রবাহে বজায় থাকা, সরকারের মূলধনী বাজেটের বর্ধিত বাস্তবায়ন এবং কাঠামোগত সংস্কার এগিয়ে নেয়া ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা বিদূরণে দাতাদের অব্যাহত সহায়তার ভিত্তিতে জিডিপির অভিক্ষিপ্ত প্রবৃদ্ধি ৬%। তৈরি শিল্প খাতে ২০১০ সালে প্রবৃদ্ধি মন্থর হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেননা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে অর্থনৈতিক মন্থরতা এ খাতের সর্বাধিক বিক্রীত রপ্তানি পণ্য পোশাক শিল্পের চাহিদায় বিরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

নীতির ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়

২০০৮ সালে খাদ্য ও জ্বালানির দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জনসংখ্যার বিরাট অংশের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতি দরিদ্রদের ওপর অসমভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলে বলে উচ্চহারে দারিদ্র্যকবলিত উপঅঞ্চলের অনেক দেশের জন্য এটা একটা গুরুতর সমস্যা। কোনো কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতির গতি কমে এলেও এই হার এখনো উচ্চ। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ উপঅঞ্চলের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে এবং থাকবে। খাদ্য ও জ্বালানির আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাসের ফলে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ২০০৮ সালের ১২.৩% থেকে ২০০৯ সালে ৭.২%-এ নেমে আসে। কৃষি খাত, বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনে উন্নত সাফল্যও এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে। খাদ্য-বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি তুলনামূলকভাবে কম এবং তা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে।

বাণিজ্য দ্রুত হ্রাস পেলেও শ্রমিকদের রেমিটেন্সের অবস্থা জোরালো

আমদানি-রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রের প্রসারেই বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরূপ অভিঘাত পড়ে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের রেমিটেন্স জোরালো সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং তা চলতি হিসেবের স্থিতিপত্রে সহায়তা করে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে দায় পরিশোধ স্থিতিপত্র যথেষ্ট জোরদার হয়, যাতে চলতি হিসেবে জিডিপির ১% উদ্বৃত্ত ছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু এবং মূলধনী ও মধ্যবর্তী পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার পর আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০০৮ সালের ২৬.১% থেকে ২০০৯ সালে লক্ষণীয়ভাবে ৪.১%-এ নেমে আসে। খাদ্য ও জ্বালানির আমদানি মূল্য হ্রাস এবং ভালো ফলনও একটা ভূমিকা পালন করে। পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের অব্যাহত থাকে, কারণ বাংলাদেশ বহুলাংশে প্রান্তিক বাজারের জন্য তৈরি করে যা মন্দায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট রপ্তানি বেড়ে ২০০৮ সালে ১৫.৮% এবং ২০০৯ সালে ১০.৩% হয়। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশের যেখানে জোড় সংখ্যার অবনতি ঘটেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সেখানে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য অর্থনীতির চেয়ে বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। একই সময়ে ২০০৯ সালে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স ২২% বেড়ে ৯৭০ কোটি ডলারে পৌঁছে যা জিডিপির প্রায় ১১% এবং এটাও চলতি হিসাবের স্থিতিপত্রকে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশি টাকা অপেক্ষাকৃতভাবে স্থিতিশীল অবস্থানে থাকে।

সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতিতে গতির সঞ্চার

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য সকল উপঅঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় সরকারগুলো বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা ও প্রবৃদ্ধির অবনতিকে সীমিত করার লক্ষ্যে সম্প্রসারণমূলক আর্থিক ও মুদ্রা নীতি ব্যবহার করে। কোনো কোনো দেশে বাজেটে অব্যাহত ঘাটতির আধিক্য উদ্বেগের কারণ হলেও অন্যান্য দেশে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে আর্থিক ঘাটতির কিছুটা উন্নতি হয়। ফলে মুদ্রানীতিতে কিছুটা কঠোরতার প্রত্যাশাও করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪%-এ সীমিত থাকে, যার আংশিক কারণ হলো উন্নয়ন বাজেটের কম বাস্তবায়ন। ২০১০ সালে বাজেট ঘাটতির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপির ৫%। বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধির কারণ হলো রপ্তানিমুখী শিল্পের সাহায্যে উদ্দীপনামূলক ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দরুন ভর্তুকি ও চলতি ব্যয় বৃদ্ধি। অন্যদিকে আংশিকভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুন হ্রাসমান আমদানি মূল্য ও পরিমাণের কারণে বিশেষ করে শুল্ক খাতে আয় হ্রাস পাওয়ায় কর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

দ্রুত দারিদ্র্য মোচনে উচ্চ ও সামুদয়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখা

দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের জন্য ব্যাপক দারিদ্র্য একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। তাই দারিদ্র্যের পর্যায় নামিয়ে আনার জন্য ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ। চ্যালেঞ্জ হবে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের মধ্যে প্রবৃদ্ধির কল্যাণকে প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে আরো সামুদয়িক করা। বিশেষ করে কম আয়ের লোকদের জন্য শিল্প, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও গৃহায়নের মতো মৌলিক পরিসেবার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আরো সম্পদ নিয়োজিত করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে দরিদ্রদের কল্যাণে লক্ষ্য নির্ধারিত কর্মসূচিও একটি অগ্রাধিকার হতে হবে। ভারতে যে ভারতীয় জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ স্কিম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে অনুরূপ কর্মসূচি অনেক দেশে নেয়া যেতে পারে। এই স্কিমের আওতায় যেসব পরিবারের সদস্য স্বেচ্ছায় অদক্ষ কায়িক কাজে আগ্রহী তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতি বছর ১শ' দিনের জন্য ন্যূনতম মজুরিতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা রয়েছে।

পরিবার ও অভিবাসন

পরিবারে অভিবাসনের সুফল

পরিবারের কোনো সদস্য অভিবাসন করলে সেই পরিবার বিভিন্নভাবে সুফল ভোগ করে :

- রেমিটেন্সের মাধ্যমে উন্নত জীবিকা
- উন্নত সামর্থ্য–শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সুযোগ লাভ
- পরিসম্পদ ও বর্ধিত বিনিয়োগের সুযোগ
- আয় বহুমুখীকরণ
- সামাজিক সুরক্ষা
- মর্যাদা
- *Avi mgv‡Ri †¶‡Î Awfevm‡bi eûgLx cfve*

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের প্রবণতা

- ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়স শ্রেণীর প্রধানত পুরুষ
- বেশিরভাগই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক যারা পরিবার ছেড়ে বাইরে যায়
- প্রধানত উপসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসন (৮০%–এর ওপরে)
- বেশিরভাগই স্বল্প ও অর্ধদক্ষ
- অভিবাসনের উচ্চ ব্যয় : সুফলকে ন্যূনতম করে
- রেমিটেন্স প্রধানত ব্যবহৃত হয় ঋণ পরিশোধ ও পারিবারিক ব্যয়ে : পরিসম্পদ গড়ে তুলতে ব্যয় হয় সামান্য
- রেমিটেন্সের ওপর পরিবারের অত্যধিক নির্ভরতা
- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় শোষণ হয় উল্লেখযোগ্য হারে
- প্রধান শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ : গত বছর ৫ লাখের বেশি শ্রমিক বিদেশে কাজের জন্য দেশ ত্যাগ করে
- রেমিটেন্স ২০০৯ সালে ১ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।
- রেমিটেন্সের পরিমাণ বিদেশি সরকারি সাহায্যের ৫ গুণ : এফডিআইর ১১ গুণ; জিডিপির ১৩% (বছরে বৃদ্ধির হার ১০%)
- কিন্তু বাংলাদেশিরা সবচেয়ে কম বেতনে নিয়োগ করা শ্রমিকদের অন্যতম; অভিবাসন করতে তাদের সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হয়; তাদের বেশিরভাগই স্বল্প দক্ষ শ্রেণীর
- অভিবাসীরা 'বীর' হিসেবে পরিগণিত, যারা ফেরত আসে তাদের জবাবদিহিতা করতে হয় না; পরিবারের চিন্তাভাবনা নেই।
- পরিবার দেশে রেখে যায়; ৬০ লাখের বেশি অভিবাসী;

বাংলাদেশে পরিবারভিত্তিক রেমিটেন্স জরিপ ২০০৯

- ১০,০০০ অভিবাসী পরিবারের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে : অধিকসংখ্যক অভিবাসী পরিবারের খাবার গ্রহণে উন্নতি হয়েছে। অভিবাসী পরিবারের খাবার

গ্রহণ উন্নত হয়নি	৩৮%
খাবার গ্রহণে উন্নতি হয়েছে	৬২%

বাংলাদেশে পরিবারভিত্তিক রেমিটেন্স জরিপ ২০০৯

- ৮৮% অভিবাসী পরিবারের শিক্ষার উন্নততর সুযোগ রয়েছে

উন্নতি হয়নি	১২%
উন্নত সুযোগ	৮৮%

অভিবাসনের ধরন

- আন্তঃদেশীয় অভিবাসন (যে ক্ষেত্রে অভিবাসী তার নিজ দেশে পরিবার রেখে যায়)
- পুরুষ অভিবাসীর পরিবার
- নারী অভিবাসীর পরিবার
- অভিবাসীর সঙ্গে পরিবারের দেশ ত্যাগ
- অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত পরিবার (আইডিসি), উদ্বাস্তু, পরিবেশজনিত অভিবাসী ও ফেরত আসা অভিবাসীর পরিবার

আন্তঃদেশীয় অভিবাসনের ফলাফল

পুরুষ অভিবাসীর পরিবার :

- রেমিটেন্সের ফলে ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারে, স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ নিতে পারে ও পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বেদনাদায়ক বিচ্ছিন্নতা
- ভিন্নতর আচরণ
- অভিবাসীর নতুন জীবনধারা নিয়ে অসুবিধা
- ফেরত আসাকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ও সংঘাত হতে পারে
- যৌন অনিরাপত্তা

আন্তঃদেশীয় অভিবাসনের ফলাফল

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

'স্ত্রীকে ফেলে রেখে পুরুষের স্বল্পকালীন অভিবাসনের অভিঘাত' সম্পর্কে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে আইওএম পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে :

- পরিবারের গতিশীলতায় পরিবর্তন আসে
- রেমিটেন্স পাওয়ার পর স্ত্রীই কার্যত সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক হয়
- জীবনমানের উন্নয়ন
- চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ : পর্দা; যৌন অনিরাপত্তা
- অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব (অনিয়মিত রেমিটেন্স প্রবাহের সময়)
- আর্থ–সামাজিক অসহায়ত্ব (চলাফেরায় বিধিনিষেধ : পর্দা)
- স্ত্রীর কাজের ভার বৃদ্ধি
- স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত অবস্থার পরিবর্তন (স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে হুমকি বোধ করে)
- সহিংসতা ও পরিত্যাগের ঘটনা
- স্বামী প্রাথমিকভাবে চলে যাওয়ার পর যোগাযোগ না হওয়া

জরিপে সামগ্রিকভাবে দেখা গেছে যে...

- 'নারীর খাবার পরিমাণগত ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পায়'
- '(স্ত্রীর) ক্ষমতায়ন স্থিতিশীল হয় এবং তা এখন পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।'
- '(যেসব স্ত্রী) নিজের নামে রেমিটেন্স পায় তাদের ওপরে ওঠার গতিময়তা হয় সর্বাধিক।'

আন্তঃদেশীয় অভিবাসন

নারী অভিবাসীর পরিবার

- পরিবারে অর্থনৈতিক ভূমিকা বিভাগে পরিবর্তন : নারী হয় প্রধান উপার্জনকারী
- পরিবারের লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের গতিশীলতায় পরিবর্তন : পরিবার ও তার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকতর দায়িত্ব
- নারীর ক্ষমতায়ন
- মাতৃ সম্পর্কের ক্ষতি
- ফেরত আসার পর পরিত্যাগ, পরিসম্পদ হারানো; সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া

অভিবাসীর সঙ্গে দেশত্যাগী পরিবারের ক্ষেত্রে ফলাফল

- মানব উন্নয়নের উচ্চতর পর্যায়ের অঞ্চলে অভিবাসন হলে উন্নততর শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ
- নতুন দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো
- বৈষম্যের সম্ভাবনা
- চাকরির সীমিত সুযোগ
- গৃহকাতরতা

উদ্ভুত বিষয়াদি : অভিবাসীদের পরিবার জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানচ্যুতি, অভিবাসন ও মানবিক অনিরাপত্তার শিকার

- (২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত (৩টি প্রধান নদীসহ ১২টি নদনদীর) তীর ভাঙনে প্রায় ১,৩৫,৬৩২টি পরিবার আশ্রয়হীন হয়েছে)

পরিবারের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- স্থিতিশীলতা ও জীবিকার অভাব
- স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার সামান্য সুযোগ বা আদৌ কোনো সুযোগ না থাকা
- পাচার ও শোষণের ঝুঁকি

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোক (আইডিপি) এবং তাদের পরিবারের ওপর প্রভাব

- আইডিপি এবং তাদের পরিবার পরিজন স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটোছুটিতে থাকতে পারে, আত্মগোপনে যেতে পারে, অস্বাস্থ্যকর বা আশ্রয়দানে বিমুখ পরিবেশে যেতে বা অন্য যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাধ্য হতে পারে যা তাদের জন্য বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে।
- পারিবারিক দল বিচ্ছিন্ন বা বিপর্যস্ত হতে পারে, নারী অপ্রচলিত ভূমিকা গ্রহণ বা বিশেষ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

আইডিপি এবং তাদের পরিবারের ওপর প্রভাব

- স্থানচ্যুতির কারণে শিশু, প্রবীণ বা গর্ভবতী নারী বিশেষ মনোপীড়া ভোগ করতে পারে।
- আয় ও জীবিকার উৎস থেকে সরে যাওয়ার ফলে বাস্তুচ্যুত লোকদের দৈহিক ও মানসিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে।
- শিশু-কিশোরদের স্কুলে যাওয়া ব্যাহত হতে পারে।

ফেরত আসা অভিবাসী

সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট অভিবাসনের ওপর, বিশেষ করে যারা চাকরি হারিয়েছে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়েছে তাদের ওপর বিভিন্নভাবে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। তাদের পরিবারের ওপর সৃষ্ট প্রভাবগুলো হলো :

- জীবনযাত্রার মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া
- সামাজিক লজ্জা
- মানসিক প্রভাব; সহিংসতা
- পরিবারের ঋণ থাকলে দারিদ্র্যের গভীরে তলিয়ে যাওয়া
- পারিবারিক বিপর্যয় : বিয়ে ভেঙে যাওয়া

ফেরত আসা অভিবাসী এবং তাদের আর্থিক সঙ্কট

- গুয়াতেমালায় এক জরিপে (অভিবাসী সদস্য আছে এমন পরিবারের) শিশুদের ওপর আর্থিক সঙ্কটের অভিঘাত পরিলক্ষিত হয়েছে।
- আইওএম এবং ইউনিসেফের নেয়া সাক্ষাৎকারে ৩ হাজার পরিবারের ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী শতকরা ৮.৭ ভাগ শিশু আর স্কুলে যেতে পারে না এবং একই বয়সী শতকরা ৭.৪ ভাগ বা ৯২৯০৫টি শিশু পরিবারের আয় বাড়াতে কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আইওএম-এর সাড়া

- অভিবাসীদের জন্য পুনরেকত্রীকরণ কর্মসূচি
- অভিবাসীদের জন্য যাত্রাপূর্ব পরিচিতি কর্মসূচি
- ভাষ্য কেন্দ্র
- পরিবারের জন্য পুনর্মিলন কর্মসূচি
- অভিবাসীদের পরিবারের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
- রেমিটেন্স কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি
- রেমিটেন্সের জন্য আইনগত চ্যানেল ব্যবহার করা

রাবাব ফাতিমা
আঞ্চলিক প্রতিনিধি
আইওএম

নজিরবিহীন পর্যায়ের পানি দুষণের মাসুল দিতে হচ্ছে দরিদ্রদের

পানি সম্পদের নজিরবিহীন দুষণের জন্য মানবিক কর্মকা দায়ী যা ব্যাপকহারে রোগ-ব্যাধি ছড়াচ্ছে ও শিশুমৃত্যু ঘটাচ্ছে, আর এ জন্য সর্বাধিক খেসারত দিতে হচ্ছে দরিদ্রদের।

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, 'আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির জন্য পানির যে চাহিদা তা আমাদের নির্ভরতার স্থল ইতোমধ্যেই বিপন্ন ইকো ব্যবস্থা ও পরিসেবা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকৃতির নিজের পানির চাহিদার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিযোগিতা করছে। দিনের পর

দিন আমরা বিশ্বের পানি সম্পদে লাখ লাখ টন অশোধিত পয়ঃময়লা এবং শিল্প ও কৃষি বর্জ্য ঢেলে চলেছি।'

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৬২ কোটি লোক পর্যাপ্ত পানি ছাড়া জীবন নির্বাহ করে এবং অন্তত ১৮০ কোটি লোকের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন নেই। প্রতিদিন ২০ লাখ টন পয়ঃময়লা ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ বিশ্বের পানিতে মিশে পানির মানের অবনতি ঘটাচ্ছে।

উদরাময়ে আক্রান্ত প্রতি ১০টির মধ্যে ৯টির ক্ষেত্রেই দুর্বল স্যানিটেশন ও নোংরা পানি দায়ী-আর এ রোগে বছরে প্রায় ২২ লাখ লোক মারা যায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সকল মৃত্যুর শতকরা ৮.৫ ভাগের জন্য দায়ী উদরাময়, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

এসকাপের উপনির্বাহী সচিব শিগেরু মুছিদা বলেছেন, 'মানবিক মূল্য হলো প্রকৃত : শতকরা ২৫ ভাগ শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী অশোধিত পয়ঃময়লা-এসব শিশুর বয়স ৫ বছরের নিচে। আমাদের সবার বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন, কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে একটা সুস্থ জীবনের জন্য আমাদের পরিষ্কার পানি প্রয়োজন।'

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) উধর্ষ্তন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ থিয়েরি ফ্যাকন বলেছেন, পানি দুষণে আগের ধারণার চেয়ে কৃষির দায় বেশি। চীনে প্রাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করে মি. ফ্যাকন জানান যে, শিল্পবর্জ্য হ্রাসের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, কিন্তু কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ও সার প্রকৃতপক্ষে নদ-নদীর পানি অনেক বেশি দুষিত করছে।

পানি অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়

পানির প্রাপ্যতা ও অভিন্ন নদ-নদীর পানি বণ্টনের সঙ্গে জড়িত সুনির্দিষ্ট সমস্যার ওপর আলোকপাত করাও এখানে আমার জন্য কেবল যথার্থই হবে। বাংলাদেশের ২৩০টির বেশি নদ-নদী রয়েছে যার ৫৭টি সীমান্ত-অতিক্রমী বা আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ। এই ৫৭টি সীমান্ত অতিক্রমী নদ-নদীর মধ্যে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন হলো ৫৪টি এবং অবশিষ্ট ৩টির শরিকানা মিয়ানমারের সঙ্গে। ৫৭টির মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বৃহত্তম এবং বিশ্বের প্রধান সীমান্ত অতিক্রমী নদ-নদী। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন নদ-নদী হচ্ছে-তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, খোয়াই, গোমতি, মুহুরী, ভৈরব, কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা, সুরমা, কুশিয়ারা, করতোয়া, আত্রাই, ভোগাই, ফেনী, ইছামতি, কালিন্দি, শঙ্খ, নাফ ও মাতামুহুরি। শেষের তিনটির শরিকানা মিয়ানমারের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত-অতিক্রমী নদী।

ফারাক্কায় শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি শরিকানা ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে (গঙ্গা চুক্তি অনুসারে) শুরু হয়েছে এবং সেই থেকে প্রতি বছরের ৩১ মে পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকছে। অবশ্য চুক্তির পরিশিষ্ট ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিমাণের সঙ্গে আমাদের প্রাপ্ত পানির হিস্যা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৭-২০০৬ সালের সময় থেকে বাংলাদেশ ফারাক্কায় মোট ১৫০টি দশ দিনের মেয়াদে ৫৪টি দশ দিনের হিস্যায় কম পানি পেয়েছে। আমার মনে যে, যৌথ নদী কমিশন এ সমস্যার সমাধান করছে এবং চুক্তির ধারা ১০-এর বিধান অনুযায়ী বণ্টন ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন কিনা তাও বিবেচনা করে দেখছে।

আরেকটি সীমান্ত অতিক্রমী গুরুত্বপূর্ণ

নদী তিস্তার কথাও আলোচনায় উঠে এসেছে। চুক্তির ধারা ৯-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ আলোচনা করছে। উভয় দেশে পানির প্রাপ্যতা খতিয়ে দেখা এবং ভারত ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন হিস্যা নিরূপণের জন্য একটি যৌথ কারিগরি গ্রুপ (জেটিজি) গঠন করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময়ও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের পানি সম্পদমন্ত্রীও আরো আলোচনা এবং একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার জন্য মাত্র ভারত সফর করে এসেছেন। ভারতের গজলডোবা বাঁধ বা আমাদের তিস্তা বাঁধ নির্মাণের কারিগরি বিষয়ের বিশদ কিছুতে আমি যাব না। আমি কেবল আশা করি যে, এ উপঅঞ্চলের মানুষ যাতে পানির স্থিতিশীল প্রবাহ পেতে পারে তজ্জন্য দেরি না করে শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান করা হবে।

মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতি, ধরলা, দুধকুমার ও ফেনী নদীর পানি বণ্টন নিয়েও বৈঠক হয়েছে। অভিন্ন নদ-নদীগুলোর তীর রক্ষার অনিষ্পন্ন কাজ পুনরায় শুরু করা এবং সীমান্তবর্তী নদ-নদীতে বাঁধ দেয়ার বিষয়ে একযোগে কাজ করা নিয়েও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।

ভারতের কাছে বাংলাদেশ আরেকটি প্রস্তাব দিয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গায় পানির প্রবাহ হ্রাস পায় বলে বাংলাদেশ প্রস্তাব দিয়েছে যে, পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নেপালে সংরক্ষণাধার নির্মাণের মাধ্যমে গঙ্গা অববাহিকার উজানে বর্ষাকালের কিছু পানি ধরে রাখার প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। সিন্ধু নদের পানি চুক্তির ক্ষেত্রে যেভাবে হয়েছিল সেভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আমাদের অভিন্ন বন্ধুগণ ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুপক্ষীয় সহযোগিতার পথ সুগম করতে পারে। ভারত এ বিষয়ে এখনো সম্মত হয়নি। আবুধাবি সংলাপ নামে অভিহিত নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি অংশীদারিত্ব ও বিশ্বব্যাংক অবশ্য এ ধরনের সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিষয়টি দেখার জন্য এটা গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সম্ভব করে তোলার জন্য তিনটি সরকারেরই যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় প্রেক্ষিতে পানি ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার পর আমি এখন আমাদের দেশে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতার প্রসঙ্গে যাব। ওয়াসা তার ভোক্তাদের যে পানি সরবরাহ করে তার মানের প্রতি আমাদের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার পর বিষয়টি বিশেষ মনোযোগে এসেছে।

আমাদের বোতলজাত পানি কতটা নিরাপদ আমি সেই প্রশ্নে যাব।

ঢাকা ও আমাদের দেশের অন্যান্য স্থানে খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল দেয়ার ওপর আমি টেলিভিশনে একদিন একটা অনুষ্ঠান দেখছিলাম। ঢাকার সদরঘাট ও চকবাজার এলাকার কিছু লোককে নকল লেবেল আঁটা প্লাস্টিক কনটেইনারে সরাসরি টেপ থেকে পানি ভর্তি করার সময় কীভাবে ধরা হয়েছে তা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কিছু ফুটেজে দেখানো হয়। দৃশ্যত পরবর্তীকালে তারা অনিরাপদ পানি ভর্তি এসব বোতল বিশ্বাসযোগ্য ছিপি এঁটে নিরাপদ খাবার পানি হিসেবে অসতর্ক ক্রেতাদের কাছে বাজারজাত করছিল।

দূষিত বোতলজাত পানি বিক্রির ওপর এই অংশটুকু অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পানিশূন্যতা পরিহারের জন্য এ ধরনের একটি উৎসের ওপর আমাদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণে এ ধরনের কাজটি মারাত্মকভাবে ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফুটানো পানির অভাবে ও পাইপে সরবরাহকৃত পানি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারার কারণে লোকে গরম ও আর্দ্র অবস্থায় পিপাসা মেটানোর জন্য নিরাপদ ভেবে বিশ্বাসযোগ্য ছিপি আঁটা প্লাস্টিক বোতলের পানির ওপর ভরসা করে।

ভোক্তার এই অসহায়ত্বের বিষয়টির কথা ভেবে আমি নিজে এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি। যে তথ্য আমি পাই তাতে বিস্মিত হয়ে যাই।

গ্রন্থিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে ঢাকায় 'অ্যাকুয়া মিনারেল' প্রথম বোতলজাত পানির কারখানা স্থাপন করে। এরপর দৃশ্যপটে আসে 'এভারেস্ট' (১৯৯৩), 'ডানকান' (১৯৯৪), 'মাম' (২০০০) ও 'ফ্রেশ' (২০০২)। নগরায়ন ও বিদেশ থেকে আগত লোকদের (বিশেষ করে ছুটিতে বাংলাদেশে আসা অভিবাসী শ্রমিক ও অনিবাসী বাংলাদেশিদের) ক্রমবর্ধমান ধারায় বহিরাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পাইপের মাধ্যমে ওয়াসার সরবরাহকৃত পানির পানযোগ্যতার ওপর আস্থার অভাব কয়েকটি বোতলজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

এসব কারখানার সবগুলোই রাজধানী শহর ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং তার আশপাশে স্থাপিত। বোতলজাত পানির বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট বিভাগীয় ও জেলা শহরেও গড়ে উঠেছে।

গোড়ার দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কারবারিরা সম্মিলিভাবে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ লোকের জন্য অর্ধ লিটার ও ১ লিটার থেকে ২ লিটার আকৃতির ছোট ছোট

বোতলে পানির জোগান দিত। এসব বোতল তৈরি হতো খাবার রাখার মানোপযোগী পিভিসি দিয়ে। পরবর্তীকালে পিইটি দিয়ে তৈরি বোতল চালু করা হয়। ক্রমান্বয়ে পানি বোতলজাতকারীরা বড় বড় ভোক্তা অফিসে সরবরাহের জন্য পিসি দিয়ে তৈরি ২০ লিটারের জার প্রবর্তন করে। ছোট ছোট শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ২০ লিটারের জারে তাদের পানি বিক্রি করত। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, দেশে এখন পানি বোতলজাত করার প্রায় ২শ' কারখানা আছে, যেগুলোর মধ্যে মাত্র ১৫টি প্রতিষ্ঠান ছোট বোতলে পানি সরবরাহে সক্রিয় রয়েছে।

অপেক্ষাকৃত এই নিয়ন্ত্রণবিহীন খাতে অত্যন্ত উচ্চ মুনাফার সম্ভাবনা ও এক্ষেত্রে জ্যামিতিক হারে উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। যেমন আশা করা হয়েছিল, তেমনিভাবে তাদের সবাই এ দাবিও করে যে, তাদের পানি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ও টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) নির্ধারিত মান পূরণ করে।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বড় বড় কনটেইনারে পানি সরবরাহকারীদের অনেকেই বিধিবিধান মানে না এবং সাধারণ টেপের পানি ফুটানো ও পরিশ্রুত পানি বা মিনারেল স্প্রিং পানি বলেও চালিয়ে দেয়। তারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পানি সরবরাহ করে বলে তাদের বাজার বিস্তৃত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, বেশিরভাগ সরবরাহকারীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম বা পরীক্ষা করার উপযুক্ত ল্যাবরেটরি নেই। ফলে অনেক অফিস, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ ও পথের পাশে খাবার দোকান কম মূল্যে প্রচুর পরিমাণে এসব পানি কিনে পরিণতিতে পরিপাকতন্ত্রের ব্যাধির বিস্তার ঘটাচ্ছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও প্রাকৃতিক মিনারেল পানিকে শৈবাল, জুপ্লাঙ্কটন, পরজীবী ও বিষক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম অবয়বীর মতো রোগের বিস্তার ঘটানোর সকল ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এটাও বুঝতে হবে যে খাবার পানি ও প্রাকৃতিক খনিজ পানির রাসায়নিক গঠন ভিন্ন। খাবার পানির উৎস ও তা শোধন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতার কারণে খনিজ যৌগ ও অপরিহার্য উপাদানের উপস্থিতিতেও ভিন্নতা রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে জীবাণুঘটিত বিশুদ্ধতাও নিশ্চিত করতে হবে।

এই স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে বিএসটিআইএকে আমাদের সতর্ক প্রহরী হওয়ার কথা। বোতলের গায়ে মোড়কে লিখিত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বোতলের পানিতে থাকা নিশ্চিত করা তাদের কর্তব্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বিএসটিআই তাদের প্রত্যাশিত কর্তব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তাদের কাছে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এই কর্তৃপক্ষ কদাচিৎ পরিদর্শন চালায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সাধারণ ব্যাপার।

আমরা এখানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি যার সঙ্গে আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ জড়িত। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, একটি পানি ভোক্তা সমিতি গঠন ও এ শিল্পের জন্য কঠোরতর বিধিবিধানের সময় এসেছে। নিশ্চিতই এটা হচ্ছে না। এ ধরনের একটি সমিতিকে আইনগতভাবে আমাদের অধিকার রক্ষা এবং বিদ্যমান মান কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যেত।

ধৈর্য সহকার আমার কথা শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ২৭ মার্চ, ২০১০, ইউএনএবি বৈঠক, ঢাকা।

ঢাকা ওয়াসা : কিছু তথ্য

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানীয় জল সরবরাহকারী সংস্থার নাম ঢাকা ওয়াসা।
- বিশ্বের সর্বনিম্ন দামে যে সংস্থাটি পানীয় জল সরবরাহ করে তার নাম ঢাকা ওয়াসা।
- ঢাকাবাসীর পানীয় জলের দৈনিক চাহিদা ২২০ কোটি লিটার। এর মধ্যে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ১৯০ কোটি লিটার সরবরাহ করে থাকে।
- ঢাকা ওয়াসার জল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজার পরিবার (অনুমোদিত সংখ্যা)
- ঢাকা ওয়াসা ৫৪৫টি গভীর নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ করে।
- তাদের পাম্পের জন্য জেনারেটর আছে ২৯০টি।
- ওভারহেড ট্যাঙ্কগুলো প্রায় সবগুলোই অকেজো।
- গভীর নলকূপের সরবরাহকৃত পানি দুষণমুক্ত।
- সায়েদাবাদে শীতলক্ষ্যা থেকে প্রায় ২২.৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

(তথ্যসূত্র : চেয়ারম্যান, ওয়াসা)

মোহাম্মদ জমির
সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশ সরকার

we. . 22 gvP wek cwb w`e‡m Dc¯wcZ ce‡Üi AvsikK Abev`)

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালন ১৪ এপ্রিল, ২০১০

ইউনিভার্সেল পিস ফেডারেশন, উইমেন্স ফেডারেশন অব ওয়ার্ল্ড পিস এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উইমেন্স ফেডারেশন অব ওয়ার্ল্ড পিস-এর প্রেসিডেন্ট জিনাত আরা ভুঁইয়া। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান।

বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. শমশের আলী

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে সেমিনার ১৬ মে, ২০১০

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট যৌথভাবে এক সেমিনারের আয়োজন করে। বাংলাদেশের জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী আর্থার এরকেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইওএম-এর আঞ্চলিক প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অন্যদের মাঝে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব রাজিয়া বেগম। ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মিসেস তাজকেরা খায়ের ও ড. জয়নাব বেগম। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সেমিনারে একজন অংশগ্রহণকারী বক্তব্য রাখছেন

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১৫ মে, ২০১০

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট রমনা পার্ক চত্বরে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের পরিবারসহ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ইউনিকের মিসেস মমতাজ বেগম অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। সাংস্কৃতিক পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সানজিদা চৌধুরী স্বর্ণা

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org